দেবী শক্তি মহামায়া

ম ণি দী পা বো স

যা দেবী সর্বভুতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।

কবে আসবে মহালয়া, কবে আকাশে বাতাসে বাজবে আগমনীর সুর—বাঙালি তার থোড়াই কেয়ার করে। বিসর্জনের বাজনা থামতে না থামতেই, সিঁদুরখেলার রং উঠতে না উঠতেই, 'আসছে বছর আবার হবে' বলে পরের পুজোর দিন গুনতে সুরে করে বাঙালি। সেই কবে কৃত্তিবাসের রাম রাবণবধের আগে দুর্গামায়ের আশীর্বাদ নিতে তাঁকে ডেকেছিলেন অসময়ে, অকালে—বাসন্তীপুজোর ঢের আগে। সেই থেকে বাঙালির মা দুর্গা আসেন যখন শরতের আকাশে সাদা মেঘ উড়ে বেড়ায়, যখন কাশফুলের দোল মাথা নাড়ায় হালকা হাওয়ায় আর যখন শিউলির গন্ধ পুজোর গন্ধ নিয়ে আসে। মা আসেন অকালবোধনে। দেবীশক্তির রূপ হয়ে, অসুর তথা অশুভকে বিনাশ করতে।

কাঞ্চির দেবীমূর্তি

দেবীর আরাধনা

হিন্দু ধর্মে দেবী শক্তির পুজো কিন্তু অনেক পুরোনো। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই শুরু স্ত্রী শক্তির আরাধনা। হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই Mother goddess বা স্ত্রী শক্তির প্রতীকস্বরূপ নারী মূর্তি, মৃন্ময় পাত্রে আঁকা চিত্র, এবং রিংস্টোনের ওপর কারুকার্য দেখা যায়। হরপ্পা থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের এই সব মূর্তি, সিল, বা কয়েন ঘেঁটে দেখে পরিষ্কারভাবে একটা দেবীমূর্তির বিবর্তনের ছবি ফুটে ওঠে। হরপ্পার একটা সিলে দেখা যায় একটা উলটো করা নারীমূর্তির গর্ভ থেকে গাছ বেরিয়ে আসছে; সেই একইভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি সিলে দেখা যায় প্রায় একইভাবে বসা একটা নারীমূর্তি যার গলা থেকে পদ্মফুল বেরিয়ে আছে। এই গাছ বা ফুলের সঙ্গে দেবীর যোগাযোগটা খুব ভালো করে ফুটে ওঠে শাকম্ভরী রূপের মধ্যে (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)। এই যোগাযোগটা আরও জোরালোভাবে চোখের সামনে আসে যখন দুর্গাপুজোর সময় নবপত্রিকা উৎসব পালন করা হয়। খুব স্বচ্ছভাবেই বোঝা যায় যে গাছপালার স্বরূপ হিসেবে দেবীকে পুজো করা হচ্ছে। নবপত্রিকার এই পুজোয় থাকে নয়রকমের গাছ: রম্ভা বা কলা গাছ, কচু গাছ, হরিদ্রা বা হলুদ গাছ, জয়ন্তী বা বার্লি গাছ, বেল গাছ, ডালিম বা বেদানা, অশোক, মান্না বা মানা, এবং ধান। কলা গাছ যেমন ব্রাহ্মণীর প্রতীক, তেমনই কচু কালিকার, হলুদ

Scanned by CamScanner

দেবীমূর্তি

দুর্গার, জয়ন্তী কার্তিকীর, বেল শিবের, বেদানা রক্তদন্তিকার, অশোক হল শোকরহিতা, মানকচু চামুণ্ডার এবং ধান লক্ষ্মীর। অর্থাৎ এখানে দেবী হলেন শস্যদায়িনী পৃথিবীর প্রতিবিম্ব, যেখানে শস্য এবং অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন হয় এবং যা সব প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে।

বৈদিক যুগের শুরুতে (অর্থাৎ ঋগ্বেদের কালে দেবীপুজোর বিশেষ কোনো প্রাধান্য ছিল না। তবে কিছু দেবীর উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে,যথা অদিতি, উষা, ভূদেবী/পৃথিবী, রাত্রি, সরস্বতী, ধীসনা, ইলা, ইত্যাদি। বাক্-দেবীর বর্ণনার মধ্যে দেবী সূক্তে শক্তির একটা সুন্দর আভাস দেওয়া আছে। পরের দিকে রচিত বৈদিক গ্রন্থগুলিতে দেবীদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, যথা অম্বিকা, উমা, দুর্গা, কালী, ইত্যাদি। অম্বিকার উল্লেখ পাওয়া যায় বাজসেনীয় সংহিতা আর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, যেখানে দেবী রুদ্রের বোন। আবার পরে অম্বিকার উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, যেখানে দেবী রুদ্রের ভার্যা। উমা হৈমবতীর উল্লেখ আছে কেনোপনিষদে যেখানে দেবী ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিমূর্তি। মণ্ডুকোপনিষদে পাওয়া যায় কালী আর করালীকে। ভদ্রকালী, ভবানী, এবং দুর্গার উল্লেখ আছে পরের দিকে আরও নানান বৈদিক সাহিত্যে, যথা গৃহ্যসূত্র, সাংখ্যায়ন ইত্যাদি।

এই ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা ছবি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। হরপ্পার মাতৃদেবী এবং বৈদিক বাক্‌দেবী থেকে পরের দিকের বৈদিক উমা, দুর্গা, কালী, ইত্যাদির মধ্যে দেবী শক্তির একটা কাল্ট বা সংগঠন তৈরির ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ঐশ্বরিক দেবী শক্তি, যা সর্বজনীন স্তরের কর্মশক্তির বিমূর্ত রূপক, তাঁর উপাসক বা ভক্তদের বলা হয় শাক্ত। শাক্তদের বিশ্বাস এই দেবীশক্তি মিশে আছে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এবং মানুষের মনের গোপন চেতনার ভিতর। লুকিয়ে থাকা এই শক্তির বিকাশ করাই হল মন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান কাজ। মানুষের ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্তি হল কুণ্ডলিনী শক্তি, যা যোগশাস্ত্রবলে বিকশিত করা যায়। পরম ব্রহ্ম, অর্থাৎ যিনি সর্বোচ্চ চেতনার রূপক, তিনিও অসম্পূর্ণ থাকেন এই দেবী শক্তির কৃপা ছাড়া।

দেবী বা নারী শক্তির পুজো হয় নানা রূপে। কখনো দেবীর নাম এবং পুজো হয় বয়েসের ভিত্তিতে। যখন দেবীর পুজো হয় এক বছরের শিশুরূপে তখন তার নাম হয় সন্ধ্যা, দু-বছরের হলে দেবীর পুজো হয় সরস্বতী নামে, সাতবছর হলে চণ্ডিকা, আট বছর হল সম্ভাবি, নয় বছরের দেবী হলেন দুর্গা, দশে গৌরী, তেরোয় মহালক্ষ্মী, এবং ষোলোতে ললিতা। আবার বীরত্বের ভিত্তিতেও দেবীর নামকরণ হয়, যেমন মহিষাসুরবধের থেকে হল মহিষাসুরমর্দিনী। তেমনি আছে দুর্গা, রক্ত-চামুণ্ডা, শাকম্ভরী, ভ্রামরী, ইত্যাদি।

আবার গুপ্ত-রূপী দেবী অর্থাৎ যে দেবী-শক্তির প্রকাশিত কোনো রূপ নেই (মহালক্ষ্মী), সেই শক্তি উদ্ভাসিত হয় তিনভাবে বা তিন প্রাকৃতিক গুণে লক্ষ্মী (রজ), মহাকালী (তম), এবং সরস্বতী (সত্ত্ব)। এই সর্বোচ্চ স্তরের দেবী মহালক্ষ্মীর আরও অনেক নাম আছে, যেমন, সৃষ্টির সময় তিনি মহাকালী, আবার প্রলয়ের সময় তিনি মহামারী, ধনবিতরণের সময় তিনি লক্ষ্মী, আবার সেই ধনধ্বংস করার সময় তিনি হয়ে যান জ্যেষ্ঠাদেবী বা অলক্ষ্মী।

অন্যদিকে মহালক্ষ্মীর প্রতিভাসিত রূপ হল এক চতুর্ভুজ দেবীর যার হাতে থাকে মাতুলুঙ্গা ফল, গদা, ঢাল, এবং কপাল। মাথায় থাকে সর্প, লিঙ্গ, এবং যোনী। দেবী যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর নাম হয় মহাকালী, তাঁর রূপ হয় অন্ধকারের মতো কালো, এবং গায়ে থাকে নরমুণ্ডমালা, আর হাতে থাকে কপাল, তলোয়ার, কাটা মুণ্ড, এবং ঢাল। তাঁকে বিভিন্ন নামে চেনা যায়, যথা, তৃষা, মহামায়া, ক্ষুধা, কালরাত্রি, ইত্যাদি। সাত্ত্বিকরূপে দেবী হন চাঁদের মতো উজ্জ্বল, এবং তাঁর হাতে থাকে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা, এবং পুস্তক। তখন দেবীর নাম হয়, সরস্বতী, মহাবিদ্যা, মহাবাণী,

Scanned by CamScanner

আর্য, ব্রহ্মাণী, বাক, ধী, ইত্যাদি। রজ রূপে দেবীর হয় সোনার মতন রং, হাতে থাকে মাতুলুঙ্গ ফল, গদা, পাত্র, খেটক, এবং চিহ্ন (নারী এবং পুরুষের)। এই তিন দেবীর রূপ থেকেই মহালক্ষ্মীর আদেশে সৃষ্টি হয় সব দেবতাদের এবং বাকি দেবীদের। অর্থাৎ দেবী মহালক্ষ্মী হলেন সৃষ্টির মূল যেখান থেকে শক্তির ধারা উৎপন্ন হয়ে চলে অবিরত।

দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী

মহাভারতের দুটো দুর্গাস্তবের মধ্যে আমরা যে বিবর্তিত দেবী কাল্টের পরিচয় পাই তা-তে দেবী দুর্গার যৌগিক রূপটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্তবগুলোয় আর্য (কৌশিকী/কাত্যায়নী) ও অনার্য সব দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে দেবীর একটি সুন্দর রূপ তৈরি হয়েছে যা একাধারে মা, বোন, আবার কন্যাও। দেবী এখানে মূলত রক্ষাকর্ত্রী, যিনি তাঁর ভক্তদের নানান বিপদ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। মজার ব্যাপার হল, অন্য মহাকাব্যে, অর্থাৎ রামায়ণে, কিন্তু দেবী কাল্ট-এর বিশেষ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, এবং রাম যুদ্ধে যখন প্রায় পরাস্ত, তখন সূর্যদেবকে স্তব-উপাসনা করার পরামর্শ পান অগস্ত্য মুনির কাছ থেকে। রাবণবধের আগে রামের দেবী দুর্গাকে পুজো করার গল্পটা আনেন কবি কৃত্তিবাস তাঁর লেখা বাংলা রামায়ণে।

পৌরাণিক লেখাগুলোর মধ্যে আমরা দেবী দুর্গার সুন্দর এবং সম্পূর্ণ রূপ পাই মার্কণ্ডেয়পুরাণে, দেবীমাহাত্ম্য অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের মধ্যে বিভিন্ন যে-স্তবগুলি আছে সেগুলো পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় কীভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই যৌগিক দেবীর। দেবীমাহাত্ম্যর নারায়ণ স্তুতির শেষ দুটো পংক্তিতে আছে দেবীর অভয় বাণী, যেখানে তিনি বলছেন যে, যুগে-যুগে ধর্মের সামনে যখনই বিপদ আসবে নানা অশুভ শক্তিস্বরূপে (অসুরের রূপে), তখন প্রতিবারই দেবী জন্ম নেবেন সেই অসুরদের বধ করে ধর্ম রক্ষা করতে। এই একই কথা আবার পরে পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা তে, শ্রীকৃষ্ণর অভয়বাণী রূপে। পৌরাণিক স্তুতিগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা সুন্দর প্রতিচ্ছবি গড়ে ওঠে যেখানে সব দৈবশক্তির মধ্যস্তরে থাকেন দেবী, যে ভাববোধটা আগেই প্রকাশ পায় ঋগ্বেদে, দেবীসূক্ত এবং রাত্রিসূক্তর মধ্যে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথমভাগে (৮২ অধ্যায়) বিধৃত দেবী দুর্গা কীভাবে সব দেবতারদের পুঞ্জীভূত ক্রোধের শক্তির মধ্যে থেকে থেকে জন্ম নেন।

বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রের মতে দেবী দুর্গার চতুর্ভুজা, অষ্টাভুজা, বা আরও অধিক সংখ্যক ভুজযুক্ত রূপ থাকতে পারে। দেবী হবেন ত্রিনয়নী, কৃষ্ণবর্ণা, সুন্দরী, সালংকারা, মাথায় করণ্ড মুকুট, এবং পরিধানে থাকবে হলুদ রঙের কাপড়। দেবীর সামনের ডানহাত থাকবে অভয়ামুদ্রাতে এবং পেছনের ডানহাতে থাকবে চক্র। সামনের বাঁ-হাত থাকবে কটক মুদ্রাতে এবং পেছনের বাঁ-হাতে থাকবে শঙ্খ। দেবীর অবস্থান হবে পদ্মাসনের ওপর, অথবা মহিষের মাথার ওপর, অথবা দেবী বসে থাকবেন সিংহের ওপর। সর্প হবে দেবীর স্তনপট্ট, এবং দেহের উপরিভাগে থাকবে রক্তিম বসন। কোথাও দেবীকে বিষ্ণুর প্রিয় ভগিনী বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং দেবীর আবির্ভাব হয়েছে আদিশক্তি থেকে। এই মত অনুযায়ী, দেবী চতুর্ভুজা বা অষ্টাভুজা। অষ্টাভুজা হলে দেবীর হাতে থাকবে শঙ্খ, চক্র, শূল, ধনুর্বাণ, খড়্গ, খেটক, আর পাশা। যদিও দেবীর অনেক রূপের বর্ণনা আছে বিভিন্ন শাস্ত্রে, তবে বাংলায় পৌরাণিক দেবী কাত্যায়নী বা মহিষাসুরমর্দিনীর পুজোটাই বেশি প্রচলিত।

মহিষাসুরবধের বিভিন্ন কাহিনি আছে বিভিন্ন পুরাণে। বরাহপুরাণ অনুযায়ী দেবী বৈষ্ণবী (বিষ্ণুর শক্তির বাহ্যপ্রকাশ) তপস্যায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁর সেবায় ছিলেন আরও অনেক দেবী। নারদ সে-স্থান অতিক্রম করার সময় দেবীকে লক্ষ করেন এবং পরে মহিষাসুরের কাছে গিয়ে দেবীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করে। সেই বর্ণনা শুনে মহিষাসুরের রোখ চেপে যায় যে ওই সুন্দরীকে ধরে এনে বিয়ে করতে হবে, এবং সে তার অসুর বাহিনী নিয়ে আসে দেবীকে ধরতে। বৈষ্ণবী এবং বাকি দেবীদের সঙ্গে মহিষাসুর বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধে মহিষাসুর সম্পূর্ণ পরাজিত

Scanned by CamScanner

কাঞ্চির দেবীমূর্তি

হয়। বামনপুরাণের গল্পটা আবার অন্য রকম। সেখানে মহিষাসুর সব দেবতাদের পরাজিত করার পর সেই দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের কাছে হাজির হয়ে তাঁদের দুঃখের কাহিনি শোনায়। সে-কথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের চোখের রশ্মি থেকে আবির্ভূত হল হাজার সূর্যের মতো প্রজ্বলিত ত্রিনয়নী দেবী কাত্যায়নী, যাঁর চুল মন নিশির মতো কালো এবং যিনি অষ্টাদভুজা। এই দেবীকে প্রধান দেবতাদের মধ্যে শিব দেন তাঁর ত্রিশূল, বিষ্ণু তাঁর চক্র, বরুণ দেন শঙ্খ, অগ্নি দেন তির, যম দেন লোহার দণ্ড, বায়ু দেন ধনুক, ইন্দ্র বজ্র, সূর্য তির-ভরা তূণীর, কুবের দেন গদা, ব্রহ্মা অক্ষমালা, কাল দেয় ঢাল তলোয়ার, এবং বিশ্বকর্মা দেয় কুঠার। এই সব অস্ত্র এবং হিমবানের দেওয়া সিংহ নিয়ে দেবী যান বিন্ধ্য পর্বতে। সেখানে দুজন অসুর চণ্ড এবং মুণ্ড দেবীকে দেখে মহিষাসুরকে খবর দেয়। মহিষাসুর দেবীকে বিবাহ করতে চাওয়ায় তখন দেবী তাকে সম্মুখসমরে আহ্বান জানান। সেই যুদ্ধে দেবী মহিষাসুরের গলা কেটে তাকে বধ করেন। সেই থেকেই তখন দেবী কাত্যায়নীর নাম হয় মহিষাসুরমর্দিনী।

মহিষাসুরমর্দিনী প্রাচীন দেবীদের মধ্যে অন্যতম, এবং দেবীর সব থেকে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় দেবীমাহাত্ম্যে। সেখানে দেবীর যে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় বেশির ভাগ সময় ফারাক পাওয়া যায় শুধু দেবীর হাতের সংখ্যার ওপর। পূর্ব ভারতের অনেক জায়গা থেকে অষ্টভুজা আর দশভুজা দেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। এই দশভুজা দেবীরই মাটির প্রতিমা গড়ে শরৎকালের অকাল বোধনে শারদীয়া দুর্গাপুজো বাঙালিদের আজ সব থেকে বড়ো ধর্মীয় উৎসব। তবে, এই দেবীর আইকোনোগ্রাফি দেখলে জানা যায় যে গুপ্তবংশের শুরুর দিকে যে দুর্গামূর্তির প্রচলন শুরু হয় সেগুলো ছিল মূলত দ্বিভুজা। মার্শাল আবিষ্কৃত এই মূর্তিগুলিতে দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে খালি হাতে বিনা অস্ত্রে যুদ্ধরত। হিমাচল প্রদেশের চাম্বা ভ্যালিতে অষ্টম শতাব্দীর রাজা মেরুবর্মনের রাজত্বকালে একটা চমৎকার চতুর্ভুজ দেবীর মূর্তি আছে যা লক্ষ্মণা দেবী নামে খ্যাত। পেতলের এই অসামান্য মূর্তিটি দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর। এখানে দেবী তাঁর সামনের বাঁ-হাত দিয়ে ল্যাজ ধরে মহিষের নিম্নভাগটা তুলে ধরেছেন, এবং ডানহাতে ধরা ত্রিশূলটি মহিষের গলায় বসিয়ে দিয়েছেন। দেবীর ডান পা মহিষের গলায় চেপে রাখা, আর পেছনের দুটো হাতে ধরা আছে তলোয়ার আর ঘণ্টা। দেবীর এই অঙ্গবিন্যাস অবিকল দেবীমাহাত্ম্য অনুসারী। ঠিক একইভাবে দেবীকে দেখতে পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের গুপ্ত যুগের উদয়গিরি গুহাতে (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল) যেখানে ঠিক একইভাবে দেবী যুদ্ধ করছেন, যদিও দেবীর বারোটা হাত। এগুলোর কোনোটাতেই দেবীর বাহন হিসেবে সিংহ নেই। তবে গঙ্গায়কোন্দাচোলপুরাম এবং কাঞ্চির কৈলাসনাথর মন্দিরগুলোয় দেবীকে দেখা যায় একই বিন্যাসে, সঙ্গে সিংহ বাহন; যদিও দেবী অনেকটাই নিশ্চল এবং প্রাণহীন। মধ্য যুগের শুরু দিকে কোনো একসময় ভাস্কররা দেবীর যুদ্ধের অঙ্গবিন্যাসটা পালটাতে শুরু করেন এবং সেই পালটানোর ধরনটা পরিষ্কার দেখা যায় মহাবলিপুরম আর ইলোরার গুহাতে। ইলোরায় দেবী অষ্টভুজা এবং সিংহবাহিনী, আর মানুষের আকারে মহিষাসুরের (শুধু মাথায় মহিষের সিং-টি আছে) সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই রিলিফটি অসাধারণ, এবং আগে তৈরি আইহলের রিলিফের সঙ্গে তুলনা করলে তফাতটা পরিষ্কার বোঝা যে ভাস্কররা কীভাবে দেবীর অঙ্গবিন্যাসটা পালটায়। আইহোয়েতে দেবী মহিষের সঙ্গে যুদ্ধরত (কোনো মানুষরূপী মহিষ নয়, সেটা পরে এসেছে দেবী আইকোনোগ্রাফিতে) এবং সিংহ পাশে চুপ করে দাঁড়ানো। পরের দিকে কিছু মূর্তিতে (ওড়িশা-হরিপুরের) দেখা যায় যে মহিষের কাটা গলা থেকে মানুষের রূপে মহিষাসুর বেরিয়ে আসছে যাকে দেবী বধ করছেন ত্রিশূল দিয়ে।

Scanned by CamScanner

উত্তর বাংলার দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে মহিষাসুরমর্দিনীর এক সুন্দর মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটার প্রধান প্রসঙ্গ হল নবদুর্গার চিত্রাঙ্কন। খুব সুন্দরভাবেভাবে এখানে নবদুর্গাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাঝখানের মূর্তিটি হল অষ্টাভুজা মহিষাসুরমর্দিনী, আর তাঁকে ঘিরে আরও আটটা ক্ষুদ্রকায় ষোড়শভুজা দুর্গামূর্তি। নবদুর্গারা ঠিক এইভাবে অবস্থান করেন, তন্ত্রের মণ্ডলা বা যন্ত্রের মতো চক্রাকারে। মাঝখানে যে মহাদেবী থাকেন তিনি সিংহবাহিনী দেবী মহিষাসুরমর্দিনী, তিনি অষ্টাদশভুজা, এবং গাত্রবর্ণ আগুনের মতো। বাকি দুর্গারা পদ্মফুলের মতন রথের ওপর আসীন, এবং তাদের গাত্রবর্ণ গোরোচনা পাথরের মতো হলুদ, লাল, কালো, নীল, সাদা, ছাই, হরিদ্রা, এবং গোলাপি।

নবদুর্গাকে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। যেমন মনিয়ার উইলিয়ামস নবদুর্গার নাম লেখেন কুমারিকা, ত্রিমূর্তি, কল্যাণী, রোহিণী, কালী, চণ্ডিকা, সম্ভাবি, দুর্গা, আর ভদ্রা। আবার দেবীকবচে (দেবীমাহাত্ম্য) নবদুর্গার নাম পাওয়া যায় শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী,চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মাণ্ড, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, আর সিদ্ধিদাত্রী। বাংলায় তথা ভারতে অবশ্য দেবীকবচে (দেবীমাহাত্ম্য) লেখা দেবীদের নাম অনুসারে নবদুর্গার পুজো হয় নবরাত্রির সময়।

শৈলপুত্রী: শৈলপুত্রী অর্থাৎ পর্বতের কন্যা। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবীর জন্ম হয় হিমালয়রাজের বাড়িতে। দেবী আরও নামে পরিচিত, যেমন পার্বতী, হৈমবতী, বা ভবানী। দেবীর দুটো হাত এবং তা-তে থাকে পদ্ম এবং ত্রিশূল। দেবীর বাহন হল নন্দী বা ষাঁড়।

ব্রহ্মচারিণী: ব্রহ্মচারিণী অর্থাৎ দেবীর এখানে তপস্বিনীর রূপ। তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এই দেবীর জন্ম হয় রাজা দক্ষের ঘরে সতী রূপে। শিবের সঙ্গে বিয়ের আগে দেবীর ছিল ব্রহ্মচারিনী রূপ। দেবীর হাতে থাকে জপমালা আর কমণ্ডল।

চন্দ্রঘন্টা: শিবের সঙ্গে বিবাহের পরে মহাদেবী চন্দ্রঘন্টার রূপ নেন, যখন তিনি ঘন্টার আকারের অর্ধচন্দ্র ধারণ করেন তাঁর কপালে। দেবী সাহস এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এর প্রতীক। তিনি দশভুজা এবং বাঘের ওপর আসীন। হাতে ত্রিশূল, গদা, তলোয়ার, কমণ্ডল, পদ্ম, তির, ধনুক, আর জপমালা।

কুষ্মাণ্ডা: কুষ্মাণ্ডা দেবী, অর্থাৎ যিনি মহাজাগতিক সৃষ্টির মূলে রয়েছেন। সিদ্ধিদাত্রী রূপ ধারণের পর দেবী সূর্যের ভেতর অবস্থান করেন, এবং তার ফলে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায় আর প্রাণের সঞ্চার হয়। দেবী অষ্টভুজা এবং সিংহের ওপর আসীন। হাতে থাকে কমণ্ডলু, গদা, ধনুক, পদ্ম, চক্র, অমৃতকলস আর জপমালা।

স্কন্দমাতা: স্কন্দমাতা অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা কার্তিক বা স্কন্দের মা যিনি। দেবীর সামনের বাঁ-হাতে ধৃত শিশু স্কন্দ, পেছনের দুটো হাতে থাকে পদ্ম, আর সামনের ডানহাত বরাভয় মুদ্রাতে।

কাত্যায়নী: মহাদেবী যখন মুনি কাত্যায়নের কন্যা, এবং মহিষাসুর বধের আগে। দেবী ক্রোধ এবং দুরাত্মা বা অসুরনাশের শক্তিস্বরূপ। দেবী সিংহের ওপর আসীন এবং চতুর্ভুজ, আর হাতে থাকে তলোয়ার, এবং পদ্ম।

কালরাত্রি: ধ্বংসের দেবী কালরাত্রির হয় ভয়ংকর রূপ এবং তৈলমর্দিত অঙ্গে কোনো বস্ত্র থাকে না। দেবী গাধার ওপর আসীন, চুল বাঁধা থাকে একটা বিনুনিতে, আর কানে থাকে কর্ণকুণ্ডলের সঙ্গে লাল ফুল। বাঁ-পায়ে থাকে লোহার গজাল দেয়া নূপুর।

মহাগৌরী: সিদ্ধিদাত্রীর ষোড়শী রূপ হল মহাগৌরী। দেবী মহাগৌরী হল বিশুদ্ধতা আর স্বচ্ছতার প্রতীক। চতুর্ভুজা দেবী বসে থাকেন নন্দীর ওপর, আর হাতে থাকে ডমরু এবং ত্রিশূল। দেবীর আশীর্বাদে সব পাপ কেটে যায়।

সিদ্ধিদাত্রী: সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন রুদ্র মহাদেবীর বা আদি-পরাশক্তির অর্চনা করেন, তখন সেই আদি পরমশক্তি কোন বাহ্য রূপ না-থাকায় সিদ্ধিদাত্রীর রূপ নিয়ে শিবের বাঁ-দিক থেকে প্রকাশ

Scanned by CamScanner

সপ্তমাতৃকা

পান। তিনি পরম আরাধ্য দেবী, সব দেবতা, অসুর, মানুষ, এবং গণদের কাছে। দেবী চতুর্ভুজা, এবং হয় পদ্মাসীন অথবা সিংহের ওপর বসে থাকেন। হাতে থাকে চক্র, শঙ্খ, গদা, আর পদ্ম।

সপ্তমাতৃকা

বিভিন্ন পুরাণের (কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ, মৎস্যপুরাণ) মতে নরসিংহ দ্বারা দিতির দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু বধের পরে আসে অন্ধকাসুর, যার অত্যাচারে দেবতারা অস্থির হয়ে উঠে শিবের সাহার্য্যপ্রার্থী হয়ে। শিবের সঙ্গে দেবগণের কথা বলার সময়ই অন্ধকাসুর কৈলাসে হাজির হয় পার্বতী কে অপহরণ করার জন্য। প্রচণ্ড যুদ্ধে যখন সব দেবতারা পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যান তখন শিব অন্ধকাসুরকে শরাঘাত করেন। সেই আঘাত থেকে রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্র আরও একটি অন্ধকাসুর জন্ম নেয়। প্রতিটি রক্তের ফোঁটা একটা অন্ধকাসুর তৈরি হতে থাকে এবং তারা শিবের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। শিব তখন ত্রিশূল দিয়ে প্রধান অন্ধকাসুরকে বধ করেন, বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে নতুন অন্ধকাসুরদের বধ করেন, আর রক্তবিন্দু মাটিতে পড়া বন্ধ করতে শিব এবং বাকি দেবতাদের শক্তি থেকে সৃষ্টি হয় সপ্তমাতৃকা। এই সপ্তমাতৃকারা যে যা দেবতার শক্তি থেকে সৃষ্ট সেই দেবতারই অবিকল স্ত্রী রূপ, একই অস্ত্র, বাহনও এক। দেবীমাহাত্ম্য-এ (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) অবশ্য অন্য রকমের একটা গল্প আছে। সেখানে বলা আছে যে দেবতাদের শক্তি থেকে সপ্তমাতৃকারা সৃষ্টি হন মহাদেবীকে শুম্ভ আর নিশুম্ভ এই দুই অসুরবধে সাহায্য করতে।

বরাহপুরাণের মতে মাতৃকারা হলেন অষ্টমাতৃকা। মাতৃকাদের নাম এবং সংখ্যা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দেখা যায়। প্রথম কুমারগুপ্ত-এর সময়কালে গঙ্গাধরলিপিতে মাতৃকাদের কথা বলা থাকলেও তা-তে কোনো নাম বা সংখ্যা দেয়া নেই। গোড়ার দিকের চালুক্যদের একটি লিপিতে সপ্তমাতৃকাদের কথা বলা আছে, কিন্তু সেখানেও তাঁদের নাম দেয়া নেই। বরাহমিহিরও এই বিষয়ে কিছু বলেননি, শুধু বৃহৎসংহিতা (৫-৬ শতাব্দী)-য় লিখেছেন যে দেবতাদের শক্তি থেকে মাতৃকা সৃষ্টি হয়। উৎপল (৯ শতাব্দীতে) এই প্রসঙ্গে মাতৃকাদের নামগুলো দেন: ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী/রৌদ্রী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, যামী, বারুণী, এবং কাবেরী। অন্য মাতৃকাদের নাম তিনি লেখেন নারসিংহী, বারাহী, এবং বৈনায়কী। পরবর্তীকালে ষোড়শ মাতৃকার উল্লেখ আমরা পাই—যা শুরু হয় গৌরীকে দিয়ে (গৌরিয়াদি-ষোড়শ -মাতৃক)।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে সপ্তমাতৃকারা হলেন: ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, এবং ঐন্দ্রী। এই পুরাণের ২২-তম শ্লোকে লেখা আছে যে যুদ্ধের সময় মহাদেবীর শরীর থেকে ভয়ংকর এক চণ্ডী শক্তির প্রকাশ পায় যা তীব্রগতিতে বেরিয়ে আসে একশত শৃগালের মতো আর্তনাদ করতে করতে। এই শক্তির নাম শিবদূতী, কারণ এই ভয়ঙ্কর দেবী স্বয়ং শিবকে তাঁর নিজের দূত রূপে নিযুক্ত করেন। এই সূত্রে মাতৃকার সংখ্যা হল ৮ (এখানে চামুণ্ডার বদলে রয়েছে নরসিংহী): চণ্ডীশক্তি শিবদূতী হলেন অষ্টম মাতৃকা। আবার এই পুরাণেই আগের একটা অধ্যায়ে দেখা যায় যে অম্বিকার ক্রোধান্বিত ভ্রূকুটি থেকে যে কালীর সৃষ্টি সেই কালির চণ্ড -মুণ্ড

Scanned by CamScanner

বধের পরে নাম হয় চামুণ্ডা। সাধারণত আইকোনোগ্রাফিতে তথাকথিত অনুমোদিত সপ্তমাতৃকারা হলেন ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, এবং চামুণ্ডী।

সপ্তমাতৃকাদের সাধারণত দেখা যায় আয়তক্ষেত্রাকার লম্বা একটা প্যানেলে। প্যানেলের প্রথমে থাকে বীরভদ্রা, তারপর ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, এবং চামুণ্ডী। শেষে থাকে গণেশ। আবার এমনও প্যানেল দেখা গেছে যেখানে শুধু তিনজন মাতৃকা আছে ব্রহ্মাণী, কুমারী আর বৈষ্ণবী, আর সামনে বীরভদ্রত্র এবং শেষে গণেশ। বাহন এবং অস্ত্র ছাড়াও অনেক সময় এই মাতৃকাদের কোলে থাকে একটা শিশু। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই মাতৃকাদের তন্ত্রসাধনার সঙ্গেও যুক্ত করা হয়, বিশেষ করে বারাহী এবং চামুণ্ডাকে।

ব্রহ্মাণী: এই দেবী চতুর্মুখী, এবং গায়ের রং সোনার মতো। ডানদিকের পেছনের হাতে থাকে শূল, পেছনে বাঁ হাতে অক্ষমালা। সামনের ডানহাত থাকে অভয়মুদ্রাতে, আর বাঁ-হাত বরদা মুদ্রায়। মাতৃকার অঙ্গে থাকে হলুদ বস্ত্র, মাথায় করণ্ডমুকুট, বাহন হংস, আসন হল লাল পদ্ম, এবং দেবী থাকেন পলাশ গাছের নীচে। দেবীর ছ-টি হাত থাকলে, বাঁ-হাতগুলিতে অভয়মুদ্রা পুস্তক, এবং কমণ্ডল।

মাহেশ্বরী: মাতৃকার চার হাত, দুটি হাত থাকে অভয় এবং বরদা মুদ্রাতে, আর বাকি দুটি হাতে থাকে অক্ষমালা আর শূল। সঙ্গে থাকে বাহন ষাঁড়। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অনুযায়ী, দেবী পঞ্চমুখী, ত্রিনয়নী, জটামুকুটে থাকে চাঁদ, এবং দেবীর গায়ের রং সাদা। এখানে দেবীর ছ-টা হাত এবং চারহাতে থাকে সূত্র, ডমরু, শূল, আর ঘণ্টা, এবং বাকি দুটি হাত থাকে অভয় আর বরদা মুদ্রাতে।

কৌমারী: কৌমারীর সাধারণত চারটে হাতে বরোদা এবং অভয় মুদ্রা ছাড়াও থাকে শক্তি আর মোরগ। দেবীর বাহন হল ময়ূর এবং আসন হল ডুমুর গাছের নীচে।

বৈষ্ণবী: বৈষ্ণবীর গায়ের রং কালো, পরনে হলুদ বস্ত্র, বাহন হল গরুড়, আর গলায় থাকে বনমালা। দেবীর হাথে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা, আর পদ্ম। গদা আর পদ্মর বদলে অনেক সময় হাত থেকে অভয় আর বরদা মুদ্রাতে। আর ছ-টি হাত দেখানো হলে তখন সবই দেখানো হয়।

বারাহী: দেবীর মুখ হয় বন্য শূকর আকারে, আর রং হয় ঝড়ের মেঘের মতন। মাথায় থাকে করণ্ড মুকুট, আর অঙ্গে থাকে পলার গয়না। দেবীর হাতে থাকে দণ্ড, খড়্গ, পাশ, হাল, শক্তি, আর খেটক। দেবীর হাতে কখনো স্বর্ণধনুক আর মুষলও দেখা যায়। দেবীর বাহন সাধারণত হাতি।

ইন্দ্রাণী: ত্রিনয়নী এই দেবীর হাতে থাকে বজ্র, শক্তি, কলস, সূত্র, পাত্র, আর অঙ্কুশ। দেবীর গায়ের রং লাল, মাথায় কিরীটমুকুট, এবং অঙ্গে নানারকমের গয়না। বাহন হাতি এবং দেবী থাকেন কল্পকা গাছের নীচে।

চামুণ্ডা: ত্রিনয়নী চামুণ্ডার গায়ের রং লাল, কৃশ শরীর, ভয়ঙ্কর মুখ, দুটো লম্বা দাঁত বাইরের দিরে বেরিয়ে থাকে, এবং হাতের সংখ্যা চার থেকে দশের মধ্যে। দেবীর হাতে থাকে মুষল, কবচ, বান, অঙ্কুশ, খড়্গ, খেটক, পাশা, ধনুক, দণ্ড, পরাশু। তবে বেশির ভাগ সময় দেবীর হাতে থাকে একটি কপাল (মাথার খুলির তৈরি পাত্র), সাপ, অগ্নি, আর শূল। দেবীর কানে থাকে শঙ্খকুণ্ডল, গলায় নরমুণ্ডমালা; তিনি ডুমুর গাছের নীচে বাঘছালের ওপর পদ্মাসনা। এঁর বাহন প্যাঁচা।

মাতৃমূর্তি নানান রূপ। তিনি শুধু আমাদের ঘরের কোণের লক্ষ্মী নন, অন্নপূর্ণাও নন, নন বীণাবাদিনী; তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আসেন অশুভকে বধ করতে। তখন মায়ের মধুর হাসির বদলে আসে তাঁর উগ্ররূপ, বরাভয় পালটে গিয়ে হয় অস্ত্রসমূহ। তিনি আসেন নানান রূপে—নবদুর্গা বা সপ্তমাতৃকা রূপে।

লেখিকা আগ্রহী মন্দির-গবেষক।
monidipadey@rocketmail.com

Scanned by CamScanner